ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-V, May, 2026, Page No. 2153-2159
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.05W.477

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে প্রতিবাদী চরিত্র

ড. সুপ্রিয়া দাস, *সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রামঠাকুর কলেজ, আগরতলা, ত্রিপুরা, ভারত*
ড. অরুপা চক্রবর্তী, *পি জি ফ্যাকাল্টি, বাংলা বিভাগ, মহারাজা বীর বিক্রম মহাবিদ্যালয়, আগরতলা, ত্রিপুরা, ভারত*

Received: 13.05.2026; Accepted: 25.05.2026; Available online: 31.05.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The stories of Manik Bandopadhyay prominently feature protest-oriented characters. Influenced by the post-Tagore modern literary movements like Kallol, Kalikalam, and Pragati, he portrayed the struggles of peasants, workers, and labourers from the lower strata of society with stark realism. Set against the backdrop of World War II, the Bengal Famine of 1943, and the Tebhaga Movement of 1946, stories such as Dushashaniya, Dhan, Haraner Natjamai, and Chhoto Bakulpurer Jatri depict the united resistance of common people against exploitation. These narratives show how poor and uneducated peasants and workers gradually became conscious of their rights and stood up against landlords and authorities. Collective protest, rather than individual resistance, emerges as the central theme, making these stories important historical documents of a crisis-ridden era.

Keywords: Protest-oriented Character, Tebhaga Movement, Famine, Second World War, Peasant-Worker Unity, Class Struggle, Zamindari System, Exploitation

বাংলা ছোটগল্পের আদি-অন্ত জুড়ে যেখানে রোমান্টিক ভাবালুতা আর মধ্যবিত্ত জীবনের মৃদু সংকট আবর্তিত হচ্ছিল, সেখানে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাব এক নির্মম, নিরাসক্ত ও বৈজ্ঞানিক সত্যের বিস্ফোরণ। রবীন্দ্র-শরৎ-পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যে তিনি মানুষের অবচেতন মনস্তত্ত্ব এবং কঠোর সমাজবাস্তবতাকে এক সুতীক্ষ্ণ ছুরির ফলায় ব্যবচ্ছেদ করেছেন। তাঁর গল্পবিশ্বে ‘প্রতিবাদ’ কোনো কৃত্রিম বা আকস্মিক সামাজিক অলঙ্কার নয়; তা শোষিত মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার আদিম তাগিদ এবং শ্রেণীশোষণের বিরুদ্ধে এক অনিবার্য ঐতিহাসিক প্রতিরোধ। মানিকের প্রতিবাদী চরিত্ররা প্রথাগত সাহিত্যের অতিমানবীয় বা আদর্শবাদী নায়ক নয়, তারা সমাজের চরম প্রান্তিক, লাঞ্ছিত ও অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ। খরা, বন্যা, মন্বন্তর, দাঙ্গা, জোতদার-জমিদারের অমানুষিক অর্থনৈতিক শোষণ এবং বুর্জোয়া সমাজের মেকি ভদ্রতার চাপে যখন এই চরিত্রগুলোর পিঠ দেয়ালে ঠেকে যায়, তখনই তাদের ভেতর থেকে স্ফূরণ ঘটে এক অদম্য প্রতিরোধের। প্রাথমিক পর্বে এই প্রতিরোধ যদি জৈবিক ও মনস্তাত্ত্বিক অবদমন থেকে জন্ম নিয়ে থাকে, তবে উত্তরকালে তা মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের আলোকে এক সংগঠিত শ্রেণীচেতনায় রূপান্তরিত হয়েছে। লেখক মানুষের অবচেতনের

বিকৃতির মূলে অর্থনৈতিক বৈষম্য ও শ্রেণীশোষণের কাঠামোকে শনাক্ত করেছিলেন, যার ফলে তাঁর সৃষ্ট চরিত্ররা কেবল ভাবাবেগে ভোগে না, বরং বাস্তব পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লড়াই করে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬) যখন প্রথম গল্প লিখতে শুরু করেন তার আগেই রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যাত্রা শুরু হয়েছে 'কল্লোল' (১৯২৩) 'কালিকলম' (১৯২৬) ও 'প্রগতি' কে কেন্দ্র করে। শুরু হয়েছে কঠোর বাস্তবের পটভূমিতে নিচুতলার মানুষের জীবন সংগ্রামের ছবি আঁকা। আবার ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব পরবর্তী নতুন সাম্যবাদী সমাজ ভাবনা ও ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনতত্ত্বও লেখদেরকে রীতিমতো প্রভাবিত করেছে। মানিকের প্রথম দিকের গল্পে এসব নবোদ্ভূত চিন্তা-চেতনার ছবিই আমরা পাই। কিন্তু মানিক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালীন ও তার পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ ১৯৪৯-৫০ সাল পর্যন্ত যে গল্পগুলি লেখেন সেসব গল্পে কৃষক-শ্রমিক-মজুরদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের ছবি ফুটে উঠেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের ফলে একদিকে যেমন খাদ্য ও বস্ত্রের কালোবাজারী দরিদ্র কৃষক-শ্রমিকদেরকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল অন্যদিকে তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ শুরু হয়েছিল জোতদার, জমিদার, মজুতদার, কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম। ১৯৪৬ সালে শুরু হয়েছিল বর্গাদার কৃষকদের বিখ্যাত তেভাগা আন্দোলন। অন্যদিকে কলকারখানা থেকে ছাঁটাই হওয়া শিল্প শ্রমিকরাও শুরু করেছিল ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন। মানিকের প্রতিবাদী গল্পগুলিতে বাংলাদেশের এই চরম সঙ্কটময় সময়ের একান্ত বাস্তব ছবিই ফুটে উঠেছে। তাই এগুলি গল্প হয়েও এক সঙ্কটকালীন কালপর্বের ঐতিহাসিক দলিল।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কয়েকটি বিশিষ্ট প্রতিবাদী গল্প হলো 'দুঃশাসনীয়' (শারদীয় যুগান্তর, ১৩৫২) 'হারানের নাতজামাই' (১৩৫২, পূর্বাশা, মাঘ সংখ্যা) 'ধান' (ভারতবর্ষ, ১৩৫৪) 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' (শারদীয় চলন্তিকা, ১৩৫৫) প্রভৃতি। যুদ্ধের বাজারে কাপড়ের কালোবাজারীর ফলে দরিদ্র মানুষ উলঙ্গ থেকেছে, মেয়েরা লজ্জা নিবারণের জন্য আত্মহত্যা করেছে কিংবা নিরূপায় হয়ে দেহ দান করেছে। এই ভয়ঙ্কর অবস্থার প্রতিবাদে কীভাবে শাসকদের অত্যাচারকে উপেক্ষা করে হতদরিদ্র মানুষ সংঘবদ্ধভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছে তার চমৎকার বিবরণ রয়েছে 'দুঃশাসনীয়' গল্পে। 'দুঃশাসনীয়' গল্পটি মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও পঞ্চাশের মন্বন্তরের পরবর্তী সময়ের পটভূমিতে রচিত, যেখানে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তৎকালীন সমাজব্যবস্থার এক অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও কদর্য রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। মন্বন্তর-উত্তর গ্রামবাংলার সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের জীবন তখন খাদ্যাভাবের পাশাপাশি এক তীব্র ও দুঃসহ বস্ত্রসংকটে জর্জরিত। কাপড়ের অভাবে হাতিপুর গ্রামের মানুষ, বিশেষ করে শ্রমজীবী নারীরা প্রায় অর্ধনগ্ন বা সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। মানুষের এই বস্ত্রহীনতা কেবল শারীরিক কষ্ট নয়, বরং তাদের আত্মসম্মান ও মানবিক মর্যাদাকে প্রতিদিন তিলে তিলে ধূলিসাৎ করে দিচ্ছিল। লেখক দেখিয়েছেন যে, এই সংকট কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয় নয়, বরং তা পুঁজিপতি, মহাজন ও কালোবাজারিদের তৈরি কৃত্রিম সংকট। গুদামে গুদামে কাপড়ের স্তূপ জমা থাকা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের কাছে তা পৌঁছায় না, কারণ মুনাফাখোররা মানুষের চরম অসহায়ত্বকে পুঁজি করে নিজেদের পকেট ভারী করতে ব্যস্ত। এর বিরুদ্ধে কেউ কথা বলতে গেলে বা অধিকার দাবি করলে তার ওপর নেমে আসে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক দুঃশাসন এবং জেল-জুলুমের খড়্গ।

এই চরম লাঞ্ছনা ও শোষণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদের প্রতীক হয়ে উঠেছে গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র রাবেয়া। চরম দারিদ্র্যের মাঝেও সে নিজের ন্যূনতম আত্মসম্মানটুকু বিসর্জন দিতে চায়নি। কিন্তু একপর্যায়ে সমাজ ও শোষকদের সীমাহীন লাঞ্ছনা থেকে নিজের আব্রু রক্ষা করতে এবং এই ঘৃণ্য ব্যবস্থার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করতে সে পুকুরের জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মাহুতি দেয়। রাবেয়ার এই করুণ মৃত্যু কেবল একটি আত্মহত্যা ছিল না, তা ছিল এই নিষ্ঠুর ও অন্যায় সমাজব্যবস্থার গালে এক চরম চপেটাঘাত। এই মৃত্যুকে

কেন্দ্র করেই গল্পের মোড় ঘুরে যায় এবং হাতিপুর গ্রামের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ একজোট হয়ে ফেটে পড়ে। সাধারণ, নিপীড়িত ও বস্ত্রহীন মানুষ বুঝতে পারে যে বিচ্ছিন্নভাবে নয়, বরং দলবদ্ধভাবে এই ধনতান্ত্রিক শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। রাবেয়ার আত্মত্যাগ গ্রামবাসীদের মনের ভয় দূর করে তাদের মধ্যে এক অভূতপূর্ব শ্রেণীচেতনা ও প্রতিস্পর্ধী শক্তির জাগরণ ঘটায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই গল্পে দেখিয়েছেন কীভাবে চরম দুঃশাসন ও লাঞ্ছনার মধ্য থেকেই শেষ পর্যন্ত সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের সংগঠিত প্রতিরোধের জন্ম হয়, যা শোষকের ভিত কাঁপিয়ে তোলে। হাতিপুরের একুশ'শ চাষী, তাঁতী আর আড়াই'শ ভদ্র স্ত্রী-পুরুষ উলঙ্গ অবস্থায় মহকুমা সদরে গিয়ে হাকিমের সামনে উপস্থিত হয়ে লজ্জা দিয়েছে। প্রতিবাদের এর চেয়ে অভিনব ও বলিষ্ঠ পক্ষ আর কি হতে পারে। কিন্তু তাতেও দুঃশাসনদের কদর্য নারী-মাংস লোভ থেকে মানুষ অব্যাহতি পেয়েছে? 'ধান' গল্পটিও একই সময়ের পটভূমিতে লেখা। মানুষ যখন একটু ভাতের জন্য হাহাকার করছে তখন মজুতদাররা কালোবাজারে চোরাচালান করে দিয়েছে খাদ্যদ্রব্য। 'ধান' গল্পে দেখা যায় শরৎ হালদার তার ধানের গোলায় মজুত করে রাখা ধান গোপনে কালোবাজারে পাচার করে দিয়েছে। এরই প্রতিবাদে আড়াই'শ অভুক্ত গ্রামবাসী সোনা মন্ডলের নেতৃত্বে হালদারের বাড়ী ঘেরাও করে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানিয়েছে।

'বাগ্দীপাড়া দিয়ে' মানিকের আর একটি চমৎকার প্রতিবাদী গল্প। এই গল্পে দেখা যায় বহুকাল ধরে নাল ধর্মীয় সংস্কারের গন্ডিতে আবদ্ধ পচাই মদের নেশায় আত্মবিস্মৃত দুর্ধর্ষ বাদীরা তাদেরই গ্রামের কলকারখানায় কাজ করা শ্রমিক-মজুরদের কাছ থেকে প্রতিবাদের নতুন দীক্ষা গ্রহন করেছে। জমিদারবাবু নিজ স্বার্থে ধর্মের দোহাই দিয়ে ঠাকুরের থান বানালে বর্ষার নতুন দীক্ষা গ্রহণ করেছে। জমিদারবাবু নিজ স্বার্ধে ধর্মের দোহাই দিয়ে ঠাকুরের থান বানালে বর্ষার জল-প্রবাহের পথ রুদ্ধ হয়ে যায় এবং তার ফলে বান্দীপাড়ার জল জমে গেলে পচাজলের দুর্গন্ধে সেখানে বসবাস করা দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। তাই একদিন নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বান্দী পাড়ায় শতাধিক নারী-পুরুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে নায়েব ও জমিদারের দুর্ধর্ষ লাঠিয়াল দুলে বাদীর মাথা ফাটিয়ে দিয়ে কোদাল খন্তা দিয়ে ঠাকুরের থান খুঁড়ে বদ্ধ জল নিকাশের নালা তৈরী করে দেয়। আর সেই জলের স্রোতে ভাসিয়ে দেয় ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত দুলে বাগ্দীর দেহ। অশিক্ষিত, ধর্মান্ধ, হত দরিদ্র কৃষক-শ্রমিকদের-দিনমজুর নরনারীও যে ক্রমশ নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে মানিকের গল্পে সে বিষয়টিই তুলে ধরা হয়েছে।

মানিকের ছোটগল্পগুলির মধ্যে দুটি বিশিষ্ট প্রতিবাদী গল্প হল 'হারানের নাতজামাই' ও 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী'। এই দুটি গল্পের মধ্যে প্রথমটিতে ১৯৪৬-১৯৪৯-৫০ সাল পর্যন্ত সংগঠিত কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ তেভাগা আন্দোলনের এবং দ্বিতীয়টিতে কল-কারখানার শ্রমকিদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের একান্ত বাস্তব ছবি আঁকা হয়েছে, দ্বিতীয় গল্পটিতো লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফসল। ধীরে ধীরে যে দিন বদলাচ্ছে, মুক মূঢ় মানুষের মুখে মুখে ও যে উচ্চারিত হচ্ছে প্রতিবাদের ভাষা, তারই পরিচয় রয়েছে আলোচ্য গল্প দুটিতে।

'হারানের নাতজামাই' গল্পটির বিষয়বস্তু খুই সংক্ষিপ্ত। কিন্তু সেই সংক্ষিপ্ত পরিসরেই লেখক নিপীড়িত শোষিত কৃষকদের গণ আন্দোলনের কথা তুলে ধরেছেন। গল্পটিতে দেখা যায় হারানের মেয়ে ময়নার মায়ের বুদ্ধিমত্তার ফলে পুলিশ তেভাগা আন্দোলনের কৃষক নেতা ভুবন মন্ডলকে সব আট ঘাট বেঁধে ধরতে এসে বেকুয়া বনে ফিরে যায়। লেখক গল্পের প্রারম্ভিক অংশে কৃষকদের প্রতিরোধের পরিচয় দিয়েছেন। ময়নার মা যখন ময়নাকে পুলিশ এলে কীভাবে অভিনয় করতে হবে শেখাচ্ছিল সেই সময়ই কানে এসেছে সমবেত কোলাহল। ভুবন মন্ডলকে সে বলছে "গা ভাইঙ্গা রুইখা আইতেছে। তাই না ভাবতেছিলাম, ব্যাপার কি, গাঁর মাইনষের সারা নাই।"[১] ময়নার মায়ের এই কথা থেকেই স্পষ্ট কৃষকরা, পুলিশ-প্রশাসনের ভয়কে জয়

করেছে, কেননা তারা আজ ঐক্যবদ্ধ। তাই তারা তাদের প্রিয় নেতা ভুবন মন্ডলকে পুলিশ যাতে ধরে নিয়ে না যেতে পারে তার জন্যই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে জমায়েত হয়েছে। রেডিং পার্টির নেতা হাকিমের পরোয়ানার কথা বললে একজন মুসলমান চাষী 'চেচিয়ে বলে, মোরা তল্লাশ করতে দিমু না।' হিন্দু মুসলমান কৃষক সম্প্রদায় ঐক্যবদ্ধ। তাই সমবেত দেড় শতাধিক কৃষক। পুলিশের বন্দুকের গুলির ভয়ে ভীত হয়নি ফলে শেষ পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধে ভয় পেয়ে পুলিশকেই পিছু হটতে হয়েছে। পরের দিন পুলিশের বেকুয়া বনে যাওয়ার খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে পুলিশের রেডিং পার্টির দুর্ধর্ষ নেতা মন্মথ, আরও বিশাল পুলিশের বাহিনী এবং জমিদার ও জোতদার চন্ডী ঘোষের লোক কানাই ও শ্রীপতিকে সঙ্গে নিয়ে হারানোর বাড়ীর সবাইকে ধরে নিয়ে যেতে আসে। এ খবর রটে গেলে সেই গ্রামের ও আশপাশের অন্যান্য গ্রামের লোক লাঠি, কুড়ুল, কোদাল, শাবল নিয়ে হারানের বাড়ির চারপাশে বাধাদানের জন্য সমবেত হয়েছে। মন্মথ অবাক হয়ে দেখেছে- "হারানের বাড়ির জন্য চারিদিকের গাঁ ভেঙ্গে মানুষ এসেছে, মানুষের সমুদ্র, ঝড়ের উত্তাল সমুদ্রের সঙ্গে লড়া যায় না।"[২] মানিক দেখাতে চেয়েছেন যে, সর্বহারা মানুষের সংহত শক্তির কাছে প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার, জোতদার, পুলিশ প্রশাসন ও পরাভূত হয়। এই জাগরণের কথা রবীন্দ্রনাথও বলেছিলেন:

'এই-সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে, দিতে হবে ভাষা, এই সব শান্ত শুদ্ধ ভগ্ন বুকে, ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।'

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হারানের নাতজামাই' গল্পের ময়নার মা চরিত্রটি বাংলা সাহিত্যের তেভাগা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সৃষ্টি হওয়া এক অনন্য, তেজোদ্দীপ্ত ও অবিস্মরণীয় নারী চরিত্র। লেখক এই চরিত্রে গ্রামীণ শোষিত ও শ্রমজীবী নারীর চিরাচরিত অবদমিত রূপকে ভেঙে এক প্রতিস্পর্ধী ও সংগ্রামী সত্তার উন্মোচন ঘটিয়েছেন। ময়নার মা কেবল কোনো সাধারণ গ্রামীণ বধূ বা কেবলই এক স্নেহময়ী জননী নন, বরং তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা শ্রেণীসংগ্রামের এক নির্ভীক ও অগ্রগামী নেত্রী। সমকালীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এবং জোতদার-পুলিশের যৌথ শোষণের বিরুদ্ধে গ্রামীণ নারীরা যে কতটা শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে, ময়নার মা চরিত্রটি তারই এক সার্থক ও বাস্তবসম্মত প্রতিচ্ছবি।

গল্পের শুরু থেকেই দেখা যায়, ময়নার মা চরম দারিদ্র্য ও শোষণের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও কখনো নিজের মেরুদণ্ডকে বাঁকতে দেননি। তেভাগা আন্দোলনের জোয়ারে যখন গ্রামের পুরুষরা জোতদার ও পুলিশের অমানুষিক অত্যাচারের ভয়ে অনেকেই আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছে, তখন ময়নার মার মতো সাধারণ ঘরের নারীরা ঘরের কোণ থেকে বেরিয়ে এসে আন্দোলনের সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়েছেন। লাঠি হাতে পুলিশের মুখোমুখি দাঁড়াতে বা তাদের অত্যাচারকে প্রতিহত করতে তাঁর মনে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা ভয়ের সঞ্চার হয়নি। পুরুষদের অনুপস্থিতিতে গ্রামীণ নারীদের এই যে লাঠি হাতে রুখে দাঁড়ানো এবং আন্দোলনের হাল ধরা— তা ময়নার মার চারিত্রিক দৃঢ়তা ও অসীম সাহসের কারণেই সম্ভব হয়েছিল।

ময়নার মার চরিত্রের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো তাঁর প্রখর শ্রেণীচেতনা এবং কর্তব্যের প্রতি একনিষ্ঠতা। তিনি পারিবারিক সম্পর্কের বেড়াজালে আটকে না থেকে আন্দোলনের বৃহত্তর আদর্শকে সবার ওপরে স্থান দিয়েছেন। তাঁর নিজের জামাই ভুবন যখন আন্দোলনের গতি এবং পুলিশের নির্মম বুটের শব্দ শুনে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত, শঙ্কিত বা কাপুরুষোচিত আচরণ করতে শুরু করে, তখন ময়নার মা তাকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করতে পিছপা হননি। জামাইয়ের প্রতি অন্ধ স্নেহ বা পারিবারিক মোহের চেয়ে শোষিত শ্রেণীর স্বার্থ ও লড়াইয়ের মাঠ রক্ষা করা তাঁর কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। জামাইয়ের এই মানসিক জড়তা ও ভয়কে তিনি তাঁর তীব্র বাচনভঙ্গি দিয়ে আঘাত করেছেন এবং তাকেও লড়াইয়ের ময়দানে টিকে

থাকার এক চরম প্রেরণা জুগিয়েছেন। তাঁর এই অনমনীয় ও আপসহীন মনোভাব ঘরের ভেতরের ও বাইরের সমস্ত সামাজিক জড়তাকে ভেঙে চুরমার করে দেয়।

একই সাথে ময়নার মার চরিত্রের মধ্যে এক ধরণের সহজাত নেতৃত্বগুণ ও বুভুক্ষু মানুষের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। তিনি খুব ভালো করেই জানতেন যে, জোতদার ও ব্রিটিশদের তাঁবেদার পুলিশের হাত থেকে নিজেদের হকের ধান ও অধিকার ছিনিয়ে নিতে হলে দয়া, ভিক্ষা বা কান্নাকাটি করে কোনো লাভ নেই, বরং তার জন্য প্রয়োজন শক্তির পাল্টা আঘাত। তাই পুলিশের মারমুখী রূপ দেখেও তিনি দমে যাননি, নিজের সর্বশক্তি দিয়ে সেই আক্রমণ প্রতিহত করতে চেয়েছেন এবং অন্য নারীদেরও উদ্বুদ্ধ করেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন কীভাবে যুগ যুগ ধরে চলা চরম অর্থনৈতিক শোষণ ও সামাজিক লাঞ্ছনা সাধারণ একজন গৃহবধূ বা মাকে এক নির্ভীক, লড়াকু ও অকুতোভয় নেত্রীতে রূপান্তরিত করতে পারে। সামগ্রিকভাবে বলা যায়, 'হারানের নাতজামাই' গল্পে ময়নার মা চরিত্রটি কেবল একজন ব্যক্তি নন, তিনি হলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে শোষিত মানুষের সংগঠিত শক্তির প্রতীক, গ্রামীণ নারীশক্তির জাগরণের মূর্ত রূপ এবং তেভাগা আন্দোলনের লড়াকু চেতনার এক জীবন্ত ও চিরন্তন দলিল।

'হারানের নাতজামাই' গল্পটিতে একদিকে যেমন একক প্রতিবাদী চরিত্র রয়েছে তেমনি রয়েছে সংঘবদ্ধ নেতা। তেভাগা আন্দোলনের নির্ভীক কমিউনিষ্ট নেতা ভুবন মন্ডল গ্রামে গ্রামে ঘুরে বাধে কৃষকদেরকে তাদের অধিকার বেধে উদ্বুদ্ধ করেছেন পুলিশের তুয়াক্কা না করে। আবার হারানের মেয়ে ময়নার মা, ময়নার ভাই, ময়না, ময়নার স্বামী জগমোহন প্রত্যেকেই পুলিশের সামনে নির্ভীক থেকেছে। ময়নার মা একজন অতি সাধারণ অশিক্ষিত গ্রাম্য কৃষক নারী হয়ে ও যে উপস্থিত বুদ্ধি ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছে তার বোধহয় তুলনা নেই। ময়না মায়ের কথায় ভুবন মন্ডলকে ঘরে ঢুকিয়ে ঝাঁপ বন্ধ করেছে নিজের কলঙ্ক ও চরম বিপদ ঘটতে পারে সেকথা জেনেও। ময়নার ভাইটাও কেমন নীরব থেকে দৃঢ় প্রতিবাদ জানিয়েছে। ময়নার থুতনী ধরে নাড়া দেওয়ায় ময়নার স্বামী জগমোহন দোর্দান্ত প্রতাপ পুলিশকে চড়মারতে দ্বিধা করেনি। গরীব অসহায় কৃষকরা সব ভয়কে তুচ্ছ করে পুলিশের সামনে যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে তার তুলনা নাই।

'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' গল্পটির মূলকাহিনি খুবই সামান্য। কাহিনির সময়কাল ও মাত্র দু'এক ঘন্টা। কিন্তু তার মধ্যেই গল্পটিতে যে আশ্চর্য আবহ নির্মান করা হয়েছে তাতেই মানিকের অসাধারণ শিল্পকুশলতার পরিচয় বিদ্যমান। গল্পটিতে দেখা যায় -কারখানা বন্ধ হয়ে গেলে কারখানার শ্রমিকরা মালিক ও পুলিশ-প্রশাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম করেছে। লেখকের কথায়,

> "ওই কারখানায় ধর্মঘট নিয়ে কাল স্টেশনের হাঙ্গামা। তিনজন নেতাকে ধরে টেনে চালান দেবার সময় কয়েক'শ মজুর তাদের ছিনিয়ে নিতে এসেছিল। তখন গুলি চলে, রক্তপাত ঘটে।"[৩]

গল্পের অন্যতম প্রধান চরিত্র দিবাকরের স্টেশনেই চোখে পড়ে 'একদল সশস্ত্র সিপাইয়ের দখলে রয়েছে স্টেশন'। এটা তার জানাই ছিল। কারখানায় হাঙ্গামার খবর পেয়েই সে তার স্ত্রী আন্নাকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি ছোট বকুলপুর যাচ্ছে তাদের খবরাখবর নিতে। স্টেশনেই সাক্ষাৎ হয়েছে ভদ্রবেশী দালালদের সঙ্গে। আর ছোটবকুলপুরের কাছাকাছি গিয়ে সাক্ষাৎ ঘটেছে সশস্ত্র পাহারাদারদের। তাদের সমবেত ভীতি প্রদর্শনকে দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে মোকাবিলা করেছে দিবাকর ও আন্না। একজন বন্ধ কারখানার মজুর, আর একজন কৃষক ঘরের সাধারণ মেয়ে অথচ তাদের মনের কি অসাধারণ দৃঢ়তা। কোন কিছুতেই তারা ভেঙ্গে পড়েনি, নির্ভীক নির্লিপ্তভাবে উত্তর দিয়েছে। আর সার্চ করতে গিয়ে বেকুফ বনে গেছে সশস্ত্র পাহারাদাররাই। শেষ পর্যন্ত

সন্দেহ জনক কিছু না পেয়ে যখন সিপাইবা আশাহত ঠিক সেই সময়ে পানের মোড়কের কাজটিতে ইশতাহার লেখা দেখায় তারা উল্লাসিত হয়েছে। গল্পটির শেষ এখানে হলেও অনেক না বলা কথাও যেন বলা হয়ে যায় ইঙ্গিতে। 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' গল্পটিতে দেখা যায় গ্রামে

> "খুব খানিকটা অত্যাচার হয়েছিল, কিন্তু তারপর গাঁয়েরলোক এমন আঁট ঘাট বেঁধে তৈরি হয়ে জেঁকে বসেছে যে চৌধুরী বা ঘোষদের কোন লোক অন্তত দু'ডজন রাইফেল ছাড়া গাঁয়ের ভেতরে ঢুকতেই সাহস পায়না।"[৪]

লেখক দেখিয়েছেন মজুর ও কৃষকদের সমবেত প্রতিরোধ কি ভাবে শোষক শ্রেণীর আধিপত্যকে খর্ব করে দিয়েছে। তারা অত্যাচারের শোষনের বিরুদ্ধে প্রাণ দিতে বদ্ধপরিকর। তবু তারা পরাজয় মেনে নেবেনা। তারা তাই ভেবেছে "মোরা কলির পাপীলোক, এ লড়ায়ে মোরা মরব। মোদের ছেলে পুলেরা ফের সত্যযুগ করবে।"[৫] এই কথাগুলির মাধ্যমেই মানিক এই দৃঢ় প্রত্যয় প্রকাশ করেছেন যে কৃষক শ্রমিক-মজুররা তাদের ন্যায্য অধিকার আদায় করে নেবেই।

বাংলা সাহিত্যে যথার্থ প্রতিবাদী গল্প রচনার ক্ষেত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পথিকৃৎ। মার্ক্সীয় সমাজ দর্শনে দীক্ষিত লেখক ভারত তথা বাংলাদেশের এক চরম সংকটময় পরিস্থিতির বাস্তব চিত্র তাঁর এই শ্রেনীর গল্পগুলিতে তুলে ধরেছেন। যুগযুগ ধরে ধনতান্ত্রিক সমাজের শোষণ ও নিপীড়নে যেসব দরিদ্র, অভুক্ত, অর্ধভুক্ত মানুষরা ছিল মূক, যারা কখনো তাদের 'প্রভুদের' সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি, তারাই আজ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, শিখেছে প্রতিবাদের ভাষা। একক ভাবে দরিদ্র মানুষরা ছিল দূর্বল, অসহায়। এখন তারা সুসংহত ঐক্যবদ্ধ হয়ে হয়েছে শক্তিমান, ঘটেছে গণজাগরণ। এই গণজাগরণের আকাঙ্খাই করেছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর 'পল্লী গ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থা বর্ণন' প্রবন্ধে, রবীন্দ্রনাথ 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় এবং কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'মিছিলের মুখ', 'মে দিনের কবিতা', 'লাল টুকটুকে দিন' প্রভৃতি কবিতায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মাটির কাছাকাছি সর্বহারা কৃষক শ্রমিক মজুরদের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করেছেন বলেই তাদের দুঃখ-যন্ত্রণার, তাদের নব-চেতনার কথা তাদের ভাষায় প্রকাশ করতে পেরেছেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের প্রতিবাদী চরিত্রগুলোর নান্দনিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তিনি রোমান্টিক ভাবালুতাহীন এক রুক্ষ, বাস্তব এবং মেদহীন ভাষার প্রয়োগ করেছেন। তাঁর চরিত্ররা কাল্পনিক স্লোগান দেয় না, তারা খিদের জ্বালায়, বেঁচে থাকার তাগিদে এবং অস্তিত্বের সংকটে পড়ে প্রতিবাদী হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই প্রতিবাদ কোনো একক ব্যক্তির অহংকার নয়, বরং তা সমষ্টিগত শ্রেণীচেতনার ফসল। তিনি মানুষের মনস্তাত্ত্বিক রূপরেখা থেকে শুরু করে ক্রমশ সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের সামষ্টিক রূপরেখায় নিজের গল্পবিশ্বকে প্রসারিত করেছেন। তিনি কেবল সমাজের উপরিভাগের অন্যায়কে চিহ্নিত করেননি, বরং অন্যায়ের মূল উৎস— অর্থনৈতিক শোষণ ও কাঠামোগত বৈষম্যকে আক্রমণ করেছেন। তাঁর গল্পে প্রতিবাদ কোনো তাত্ত্বিক বিলাসিতা নয়, তা মানুষের টিকে থাকার এবং মর্যাদা রক্ষার একমাত্র পথ। আজকের পুঁজিবাদী ও শোষণে জর্জরিত সমাজবাস্তবতায় দাঁড়িয়েও মানিকের এই প্রতিবাদী চরিত্রগুলো অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। যখনই সমাজে শোষণের মাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং সাধারণ মানুষের অধিকার খর্ব হয়, তখনই 'হারানের নাতজামাই'-এর ময়নারা কিংবা 'ছিনিয়ে খায়নি কেন?'-এর ভুবন মণ্ডলেরা নতুন রূপে ফিরে আসে।মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ছিনিয়ে খায়নি কেন' গল্পটি পঞ্চাশের মন্বন্তরের (১৩৫০ বঙ্গাব্দ/১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ) পটভূমিতে রচিত এক অনন্য মনস্তাত্ত্বিক ও রূঢ় বাস্তবধর্মী আখ্যান। এই গল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে পতিত বুভুক্ষু মানুষের অবর্ণনীয় কষ্ট যেমন দেখিয়েছেন, তেমনি সবচেয়ে বড় যে প্রশ্নটি তুলেছেন তা হলো— লাখ লাখ মানুষ যখন না খেতে পেয়ে ফুটপাতে ধুঁকে ধুঁকে মরছিল, তখন তারা

লঙ্গরখানার সামান্য অন্ন বা ধনীদের গুদামের খাবার ছিনিয়ে না খেয়ে কেন নীরবে মৃত্যুকে বরণ করে নিল? গল্পের মূল চরিত্র ভুবন মন্ডল ও তার পরিবার গ্রাম থেকে কলকাতায় এসে চরম খাদ্যাভাবে ধুঁকছে। ফুটপাতে বসে সামান্য একটু ফ্যান (ভাতের মাড়) বা অন্নের জন্য তাদের হাহাকার, সমকালীন সমাজের চরম অমানবিকতা ও উদাসীনতাকে উলঙ্গ করে দেয়। তীব্র ক্ষুধার জ্বালায় মানুষের ভেতরের স্বাভাবিক মনুষ্যত্ববোধ কীভাবে লোপ পায় এবং বেঁচে থাকার আদিম তাড়না কীভাবে প্রকট হয়, তা ভুবনের আচরণের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে।

গল্পের গভীরতম সত্যটি উন্মোচিত হয় শোষিত শ্রেণীর মনস্তাত্ত্বিক পরাধীনতা ও সংস্কারের জটাজাল বিশ্লেষণের মাধ্যমে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে, যুগ যুগ ধরে চলে আসা ধর্মীয় সংস্কার, ভাগ্যের লিখন, পাপ-পুণ্যের ভয় এবং আইনের প্রতি অন্ধ আনুগত্য সাধারণ মানুষের প্রতিবাদের মেরুদণ্ডকে ভেঙে দিয়েছে। তারা অনাহারে মারা যাওয়াটাকেও নিজেদের 'অদৃষ্ট' বা ভাগ্যের লিখন বলে মেনে নেয়, কিন্তু অন্যায় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর কথা ভাবতে পারে না। পুঁজিপতি ও শোষক শ্রেণী এই সুক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক দুর্বলতা ও সংস্কারকেই অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে, যার ফলে চোখের সামনে খাবারের পাহাড় থাকা সত্ত্বেও বুভুক্ষু মানুষ তা ছিনিয়ে খাওয়ার সাহস পায় না। তবে গল্পের শেষ দিকে এই সীমাহীন ট্র্যাজেডির মধ্যেও এক ধরণের সুপ্ত চেতনার ইঙ্গিত রয়েছে। ভুবনের মনে জমে থাকা ক্ষোভ এবং নিজের অসহায়ত্বের উপলব্ধি পাঠককে এক চরম আত্মজিজ্ঞাসার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। সামগ্রিকভাবে, 'ছিনিয়ে খায়নি কেন' গল্পটি কেবল মন্বন্তরের নথি নয়, এটি হলো শোষিত মানুষের নিয়তিবাদী মানসিকতার ব্যবচ্ছেদ এবং তাদের ঘুমন্ত শ্রেণীচেতনাকে জাগ্রত করার এক বলিষ্ঠ সাহিত্যিক প্রয়াস। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর তীক্ষ্ণ লেখনীর মাধ্যমে বাংলা ছোটগল্পে প্রতিবাদের যে নন্দনতত্ত্ব নির্মাণ করে গেছেন, তা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরকাল এক অপরাজেয়, দীপ্যমান ও শাশ্বত অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

তথ্যসূত্র:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, মাণিক। উত্তরকালের গল্প সংগ্রহ। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, অক্টোবর ১৯৬৪, পৃ. ২১৪।
২. তদেব, পৃ. ২২০।
৩. তদেব, পৃ. ২৭৯।
৪. তদেব, পৃ. ২৮১।
৫. তদেব, পৃ. ২৮১।